ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ ঢাকা-১০০০

ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল

রচনা ঃ
ডঃ জি, সি, হালদার, হিলশা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ
মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
মোঃ শরিফুল ইসলাম আকন্দ, উপ প্রকল্প পরিচালক
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০

Implementation Strategies of Hilsa Fisheries Conservation and Development Management

Written by: **Dr. G. C. Haldar, Hilsa Management Specialist**
Md. Rafiqul Islam, Project Co-ordinating Director
Md. Shariful Islam Akanda, Deputy Project Director
Fourth Fisheries Project, Department of Fisheries,
Bangladesh, Dhaka-1000

Fourth Fisheries Project
Department of Fisheries
Bangladesh, Dhaka-1000

প্রকাশক:
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল:
ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব:
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ:
প্রগতি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রচার সংখ্যা:
৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কপি

(সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	০৮
১.	ইলিশ মাছের গুরুত্ব	০৯
২.	ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র ও আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি	১০
৩.	টেনুয়ালোসা, হিলশা ও ইলিশা গণের মাছের পার্থক্য নির্ণয়	১০
৪.	বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি	১২
৫.	ইলিশ মাছের সামগ্রিক উৎপাদন ও বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা	১২
৬.	ইলিশ মাছ আহরণের পরিসংখ্যান নিরূপণ পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন কৌশল	১৪
৭.	ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম, জাল ও যন্ত্রপাতি	১৬
৮.	ইলিশ মাছের জীববিদ্যা	১৬
৯.	ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ও প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা	২০
১০.	জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র, জাটকা ধরার জাল, মৌসুম এবং পরিমাণ	২২
১১.	জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়	২৬
১২.	ইলিশ মাছের মজুদ নিরূপণের ফলাফল, ফলাফলের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা	২৮
১৩.	ইল্ড পার রিক্রুট (Y/R), ইলিশ মাছের প্রথম ধরার বয়স ও আহরণ মাত্রার সম্পর্ক	৩০
১৪.	বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল	৩১
১৫.	ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৩২
	১৫.১ ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রজনন সুবিধা বৃদ্ধি	৩২
	১৫.২ জাটকা সংরক্ষণ	৩২
	১৫.৩ ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ	৩২
	১৫.৪ ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ	৩৩
	১৫.৫ ইলিশ মাছের আবাস স্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়	৩৪
	১৫.৬ ইলিশ মাছের গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সর্ম্পকে গণসচেতনতা সৃষ্টি	৩৫
	১৫.৭ ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন	৩৫
	১৫.৮ প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৬
	১৫.৯ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্ত:প্রাতিষ্টানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি	৩৬
	১৫.১০ ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা	৩৬
	১৫.১১ ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরী, জনবল ও অবকাঠামো জোরদারকরণ	৩৭
	১৫.১২ ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন	৩৭
	১৫.১৩ ইলিশ মাছ পরিবহণ ও বাজার জাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান-নিয়ন্ত্রণ	৩৭
	১৫.১৪ ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরী ও রপ্তানি বৃদ্ধি	৩৮

"ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল"

১. ইলিশ মাছের গুরুত্ব

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, **একক প্রজাতি হিসাবে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ**। দেশের মৎস্য **উৎপাদনে একক ভাবে ইলিশের অবদান প্রায় শতকরা ১২-১৩ ভাগ**। বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ মে: টন যার মুল্য প্রায় **২,০০০ কোটি টাকা**। জি,ডি,পি,তে ইলিশ মাছের অবদান **প্রায় ১.০%**। জাতীয় রপ্তানি আয়েও ইলিশ মাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিবৎসর প্রায় ২,০০০-৮,০০০ মে: টন ইলিশ মাছ ভারত এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে ৫০-৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

কর্মসংস্থানে ইলিশ মাছের অবদান

কর্মসংস্থানেও ইলিশ মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের ৪০ টি জেলার প্রায় ১৪৫ টি উপজেলার ১৫০০ টি ইউনিয়নের ৪,৫০,০০০ জেলে ইলিশ মাছ ধরে থাকে। উক্ত জেলেদের মধ্যে গড়ে ৩২% সার্বক্ষণিক ভাবে এবং ৬৮% খন্ডকালীন সময়ে ইলিশ মাছ আহরণ করে। ইলিশ ধরা ছাড়াও বিপণন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাত করণ, রপ্তানি, জাল-নৌকা তৈরী ইত্যাদি কাজে সার্বিকভাবে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ লোক জীবন-জীবিকার জন্য এ মাছের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ৬ টি বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগেই ইলিশ জেলের সংখ্যা সর্বাধিক (১,০০০০০-১,৫০,০০০ জন) এবং এ বিভাগের প্রায় **৬৫% জেলে** সার্বক্ষণিকভাবে ইলিশ মাছ আহরণ করে।

খাদ্য সরবরাহে ইলিশ মাছের অবদান

বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ ইলিশ। ইলিশ মাছ খাদ্যমানেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ, চর্বি ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের চর্বিতে প্রায় **শতকরা ৫০ ভাগ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে**। উক্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের প্রায় **২%** ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা মানুষের দেহের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে হৃদরোগ উপশম করে। ইলিশ মাছের আমিষে ৯ (নয়) ধরণের এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় যা মানুষের পাকস্থলী উৎপাদন করতে পারেনা। এছাড়া ইলিশ মাছে রয়েছে উচ্চ পরিমাণে **ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি**। ইলিশের তেলে উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন **এ ও ডি** থাকে এবং কিয়ৎ **বিও মেলে**। ইলিশ মাছের যকৃতে ১২০ আই, ইউ পর্যন্ত ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের কিছু ঔষধি গুণ আছে, যেমন Flesh demulcent/Soothing, Stomachic, Phlegmatic, Carminative ইত্যাদি (চোপড়া, ১৯৩৩)। এ মাছে গড়ে ৫৩.৭ ভাগ পানি, ১৯.৪ ভাগ চর্বি, ২১.৮ ভাগ আমিষ এবং অবশিষ্ঠ পরিমাণ খনিজ পদার্থ থাকে। ইলিশ হতে **প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ** খাওয়ার **উপযোগী মাছ (flesh) পাওয়া যায়। ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ মাছের তৈলের উপর** নির্ভরশীল। ইহার দেহস্থ সুঘ্রান এবং ভাজার সময় ইহার ঘ্রাণ আশ-পাশের উল্লেখযোগ্য দূরত্বে কেন ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ জানা না থাকলেও ছোট একটি ইলিশ নিঃসৃত সুগন্ধি পার্থিব অনেক সুগন্ধিকেই হার মানায়।

প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং লোকজ সংস্কৃতিতে ইলিশ মাছের স্বাদ, খাওয়ার পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের **ইল্‌শে গুড়ি** কবিতা এখনও আমাদেরকে আলোড়িত করে। প্রাচীন কালে লোকজনের বিশ্বাস ছিল যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের **দূর্গা পূঁজার দশমির দিন হতে মাঘ-ফাল্গুন মাসের শ্রী পঞ্চমী** (সরস্বতী পূঁজার দিন) **পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা এবং খাওয়া বন্ধ রাখা হলে এ মাছ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের সুনাম (Fame), শক্তি (Strength), দীর্ঘ জীবন (Long life)** এবং **মহিমা বা গৌরব (Glory) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।**

২. ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র ও আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি

ইলিশ মাছ ইন্ডিয়ান শ্যাড (Indian shad) নামে পরিচিত। এ মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের Alosinae উপ-পরিবারের *Tenualosa* গণের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত *Tenualosa* গণটি **দীর্ঘ দিন যাবৎ *Hilsa* গণ নামে পরিচিত ছিল।** ফিসার এবং বিয়ানচি (Fisher and Bianchi, 1984) হিলশা গণটিকে *Tenualosa* গণভুক্ত করেন। সারা বিশ্বে *Tenualosa* গণের মোট ৫ প্রজাতির (species) মাছ পাওয়া যায়। *T.ilisha* প্রজাতির মাছ ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে (পারস্য উপসাগর হতে পূর্বদিকে মায়ানমার পর্যন্ত) বিস্তৃত এবং প্রধানত: বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের দেশ সমুহে, কখনও কখনও শ্রীলংকার উপকূল, টনকিন উপসাগর এবং ভিয়েতনাম উপকূলেও পাওয়া যায়। *T.toli* (মালয়েশিয়াতে **তেরুবক** নামে পরিচিত) ইন্দো-ওয়েষ্ট প্যাসিফিক (ভারত মহাসাগর হতে জাভা সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর) অঞ্চলে এবং *T.macrura* পশ্চিম-মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাভা সাগর, সারাওয়াক প্রদেশের মোহনা ও নদ-নদী) এবং থাইল্যান্ডে (দক্ষিণ অংশে) পাওয়া যায়। *T. reevesii* (রিভেসি শ্যাড) এর বিস্তৃতি *T.toli* এর প্রায় অনুরূপ। *T. thibaudeaui* (লাওশিয়ান শ্যাড) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মেকং রিভার সিস্টেম (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া), থাইল্যান্ড-লাওসের বর্ডার এলাকায় পাওয়া যায়।

৩. টেনুয়ালোসা, হিলশা *(Hilsa)* ও ইলিশা *(Ilisha)* গণের মাছের পার্থক্য নির্ণয়

Tenualosa গণের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র ***T. ilisha*** **এবং *T. toli* বা চন্দনা ইলিশ** পাওয়া যায়। টেনুয়ালোসা গণের মাছ ছাড়াও হিলশা (*Hilsa*) গণভুক্ত হিলশা কেলি (*H. kelee/kanagurta*) প্রজাতির গুর্তা/কানাগুর্তা নামে ইলিশ মাছ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে এবং পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ইলিশা (*Ilisha*) গণের ৪ প্রজাতির মাছ যথা- *I. elongata* (রামগাছা/রামচৌককা), *I. melastoma* (পেতি চৌককা), *I. megaloptera* (চৌককা/চৌককা ফাইসা), *I. filigera* (coromondel ilish), *Pellona ditchela* ইত্যাদি ইলিশ সদৃশ মাছ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়।

ইলিশ, চন্দনা ইলিশ ও গুর্তা ইলিশের পার্থক্য

ইলিশ ও চন্দনা ইলিশ *Tenualosa* এবং গুর্তা ইলিশ *Hilsa* গণভূক্ত মাছ। তিন প্রজাতির ইলিশ মাছের সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

ইলিশ	চন্দনা ইলিশ	গুর্তা ইলিশ
১। পৃষ্ঠ পাখনায় ১৮-২১, বক্ষ পাখনায় ১৫, পেলভিক পাখনায় ৮ এবং এনাল পাখনায় ১৮-২৩টি নরম কাটা (Soft ray) থাকে	১। পেলভিক পাখনায় ৮টি নরম কাটা থাকে	১। পৃষ্ঠ পাখনায় ১৬-১৯, এনালফিনে ২১-২৩, পেলভিক পাখনায় ৮টি নরম কাটা থাকে। **দেহের পিছনের দিকের আঁইশ ছিদ্রযুক্ত** (Perforated)
২। বেলী স্কিউটস (বক্ষ কাটা) এর সংখ্যা ৩০-৩৩ টি	২। বেলী স্কিউটস এর সংখ্যা ২৮-৩০ টি	২। কোন তথ্য নেই
৩। গিল আর্চের নীচের অংশে ১০০-২৫০ টি গিল রেকার আছে	৩। গিল র‍্যাকার ১০০-১৭৫ টি	৩। গিল র‍্যাকারের সংখ্যা ১০০-১৭৫ টি
৪। গিল ওপেনিং এর পরে দেহের উপরে **একটি কালো দাগ** এবং পরে বিশেষভাবে কিশোর ইলিশের ক্ষেত্রে অনেক গুলো দাগ থাকে	৪। গিল ওপেনিং এর পরে **একটি অস্পষ্ট কালো দাগ লক্ষনীয়** কিন্তু এর পর কোন কালো দাগ নেই	৪। গিলের ওপেনিং এর পরে **একটি কালো দাগ** এবং **এরপর ১০টি কালো দাগ থাকে**
৫। পুচ্ছ লোব মাথার মত লম্বা	৫। পুচ্ছ লোব **মাথার চেয়ে লম্বা**	৫। কোন তথ্য নেই
৬। উপর এবং নীচের চোয়াল সমান	৬। নীচের **চোয়াল অপেক্ষাকৃত বড়**	৬। কোন তথ্য নেই
৭। পার্শ্ব রেখায় আঁইশের সংখ্যা **৪৫-৪৭** টি	৭। পার্শ্ব রেখায় আঁইশের সংখ্যা **৪০-৪১** টি	৭। পার্শ্ব রেখায় আইশের সংখ্যা **৩৯-৪৪** টি
৮। ইলিশের মোট দৈর্ঘের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ **৮৪.২%**; ফরক **৮৭.৮%**; প্রিএনাল **৫৯.৮%**; প্রি-ডরসাল **৩৬.১%**; প্রি-পেলভিক **৩৭.৬%**; প্রি-পেকটোরাল **২২.৪%**; বডি ডেপথ **২৭.৫%**; হেড **২২.০%** এবং প্রি-অরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেডলেনথ এর **১৬.৯** ও **১৯.২%**	৮। চন্দনা ইলিশের মোট দৈর্ঘের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য **৮২.২%**; ফরক **৮৬.০%**; প্রি-এনাল **৬০.২%**; প্রি-ডরসাল **৩৫.৫%**; প্রি-পেলভিক **৩৯.৩%**; প্রি-পেকটোরাল **২৩.৫%**; বডিডেপথ **২৮.৯%**; হেড **২৪.৪%**; এবং প্রি-অরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেড লেনথ এর **২২.২** ও **২২.৯%**	৮। কোন তথ্য নেই

T. ilisha (Ilish)

T.toli (chandana ilish)

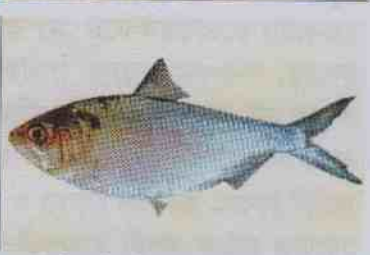

Hilsa kelee (kanagurta)

৪. বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি ব্যাপক। এক সময় দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী এবং নদী সমূহের শাখা ও উপ-নদীতেও প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বৎসরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওড়েও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যেত। বর্তমানে দেশের প্রায় **১০০টি নদ-নদীতে ইলিশ** ও জাটকা পাওয়া যায় এবং **প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ (নিম্ন অংশ), ধর্মগঞ্জ, নয়াভাংগানি** ইত্যাদি নদী এবং **মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল**। এ সকল এলাকায় **প্রায় সারা বৎসর ইলিশ ধরা পড়ে**। ইলিশের জন্য বিখ্যাত এক সময়ের **পদ্মা, ধলেশ্বরী, গড়াই,** চিত্রা, মধুমতি ইত্যাদি নদীতে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ইলিশ মাছ প্রায় পাওয়া যায়না বলা যেতে পারে।

৫. ইলিশ মাছের সামগ্রিক উৎপাদন ও বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা

T. ilisha প্রজাতির বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক হলেও বঙ্গোপসাগরের উপকূল তথা **বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ধরা পড়ে**। মায়ানমার ও ভারতের ইলিশের গড় উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় **১.০-১.২৫ এবং ০.৫০-০.৬০ লক্ষ মে:টন/বৎসর**। সার্বিক ভাবে সারা বিশ্বে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় **৩.৫০-৪.০ লক্ষ টন**। এর **মধ্যে বাংলাদেশে ৫০-৬০%, মায়ানমারে ২০-২৫%, ভারতে ১৫-২০%** এবং অবশিষ্ট ৫-১০% অন্যান্য দেশে ধরা পড়ে। ভারতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিগত ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯১/৯২ সালে প্রায় ২.০-২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছ আহরণের পরিমাণ সম্পর্কে অতীতের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। বিভিন্ন তথ্যপত্র অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকে এ অঞ্চলে ইলিশ মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ১.০-১.৫ লক্ষ মে: টন। ষাটের দশকের শুরুতে এ মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে আশির দশকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ প্রায় ১.৫ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন মৎস্য অধিদপ্তরের রির্সোস সার্ভে সিস্টেম কর্তৃক ধারাবাহিক ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্র অনুযায়ী বিগত ১৯৮৩-৮৪ ও ২০০০-০১ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে **১.৪৬ ও ২.২৯ লক্ষ মে:টন** এবং গড়ে **প্রায় ২.০৩ লক্ষ মে: টন**। এ সময়ে দেশে মোট এবং অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় হতে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ও গতি ধারা চিত্র-১, ২, ৩ এ দেখানো হলো।

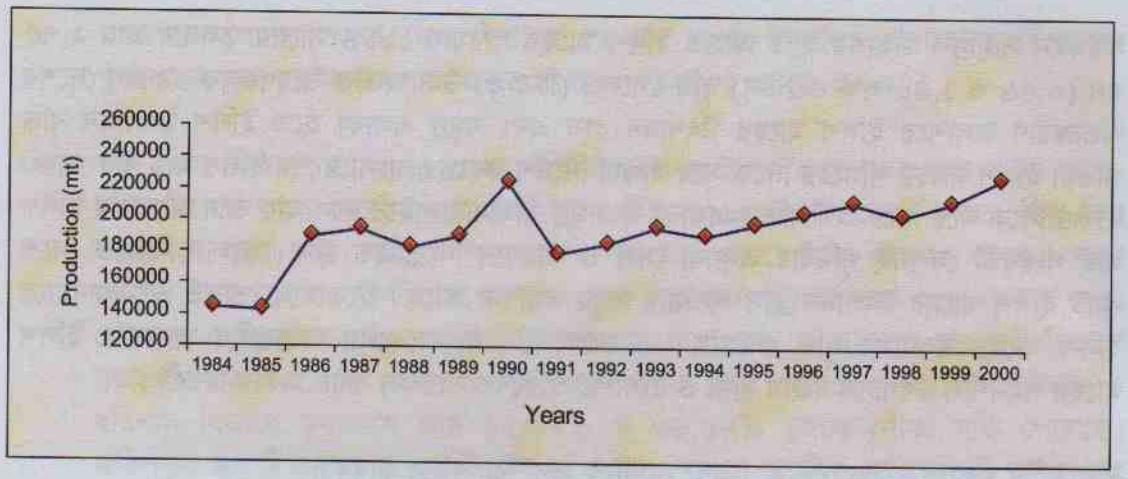

চিত্র-১: বাংলাদেশে আহৃত মোট ইলিশ মাছের পরিমাণ ও গতি ধারা

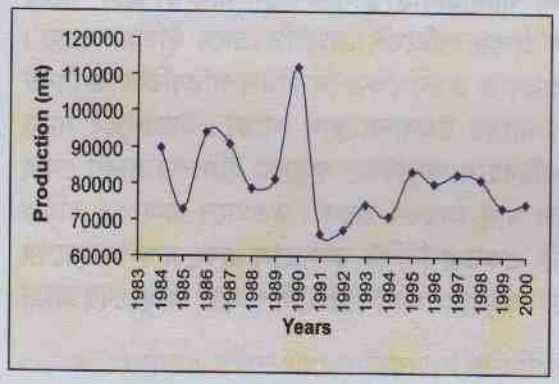

চিত্র-২: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে আহৃত ইলিশ মাছের পরিমাণ ও গতি ধারা

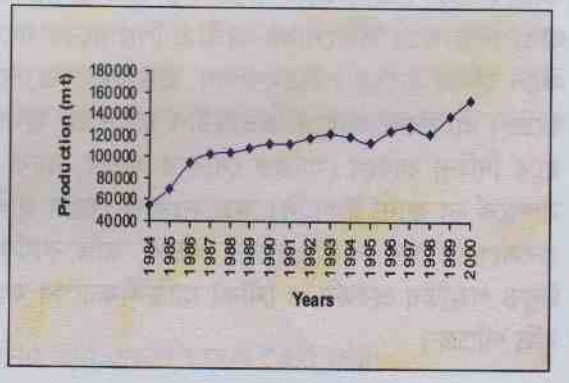

চিত্র-৩: বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয় হতে আহৃত ইলিশ মাছের পরিমাণ ও গতি ধারা

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ০.৯০ লক্ষ মে: টন। উক্ত উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ২০০০-০১ সালে মাত্র ০.৭৫ লক্ষ মে: টনে দাঁড়িয়েছে (চিত্র-২) অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন **হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১৭%, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক**। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে সর্বনিম্ন ০.৬৬ লক্ষ মে: টন ইলিশ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে। বর্তমানে দেশের মোট ইলিশ উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান মাত্র ৩৪-৩৫%। **কিন্তু অতীতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ ইলিশ মাছ পদ্মা ও মেঘনা নদী সহ দেশের বিভিন্ন নদ নদী হতে আহৃত হতো। অভ্যন্তরীণে জলাশয় হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিগত ষাটের দশকের তুলনায় প্রায় ৫০% হ্রাস পেয়েছে।**

বর্তমানে সামুদ্রিক জলাশয় হতে আহৃত ইলিশ মাছের পরিমাণ ১৯৮৪ সালের তুলনায় প্রায় ২.৭৫ গুণ (০.৫৬ ও ১.৪০ লক্ষ মেঃ টন) বৃদ্ধি পেলেও (চিত্র-৩) উহা **অত্যন্ত উদ্বেগজনক**। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস এবং সমুদ্র এলাকা হতে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া ইলিশ মাছের **সাগরের দিকে সরে যাওয়া নির্দেশ করছে**। বাংলাদেশের ইলিশ মাছ যদি আরও দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে অর্থনৈতিক এলাকা বা সমুদ্র সীমানার বাইরে চলে যায় তবে এদেশের ইলিশ মাছ **পার্শ্ববর্তী দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও আহরণে নিয়োজিত হবে**। ফলে ভবিষ্যতে দেশে মোট **ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে**। ইতোমধ্যে ভারত ও মায়ানমারে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, **বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও ইলিশের পরিবেশ সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী**।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে উৎপাদন হ্রাস এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে বৃদ্ধির কারণ

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে বিভিন্ন নদ-নদীতে বাঁধ ও ব্রীজের কারণে এবং উজান হতে পরিবাহিত পলি জমার জন্য পানি প্রবাহ ও নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ব্যতীত শিল্পায়নের ফলে জলজ পরিবেশ ক্রমাগত ভাবে দূষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথ, প্রজনন ক্ষেত্র, বিচরণ ও চারণ ক্ষেত্র দিন দিন পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হচ্ছে। এ সকল কারণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ইতোপূর্বে সমুদ্র হতে বিভিন্ন কারণে (যান্ত্রিক নৌকার অভাব, বরফ পরিবহণে অসুবিধা, সমুদ্রের ইলিশের চারণ ক্ষেত্র সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি) অল্প সংখ্যক জেলে ইলিশ মাছ আহরণ করত। বর্তমানে ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, অতি কার্যকরী **একতন্ত্র বিশিষ্ট ফাঁসজাল এবং মাছ আহরণের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ও নৌকা যান্ত্রিকীকরণের ফলে সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশ মাছ আহরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে**।

৬. ইলিশ মাছ আহরণের পরিসংখ্যান নিরূপণ পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন কৌশল

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের অন্যান্য মাছের সাথে ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান বিগত ১৯৮৩-৮৪ উন্নয়নকৃত একটি মডেলের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে। মডেলটি উত্তম **হলেও সময়ের বিবর্তন ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে** উহা হালনাগাদ করা হয়নি। তাই ইলিশ উৎপাদনের সূচকের সাথে প্রকৃত উৎপাদন সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। ফলে বাজারে ইলিশ মাছের প্রাপ্যতা ও মূল্যের সাথে যথেষ্ঠ গড়মিল দেখা যায়। বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সমূহ নিম্নরূপ:

- ইলিশ মাছের আহরণ সম্পর্কিত তথ্য জলাশয়ের অন্য সব প্রজাতির সাথে সংগ্রহ করা হয়। ফলে তথ্য সংগ্রহে কোন ভুল ভ্রান্তি হলে তা সংশোধনের সুযোগ অত্যন্ত কম থাকে;

- জলাশয়ের ধরণ, সংখ্যা, মাছ ধরার যন্ত্রের ধরণ, সংখ্যা ইত্যাদির তুলনায় নমুনার আকার খুবই ছোট এবং তা অনেক সময় প্রকৃত তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়;

- নদী এবং মোহনার Ecosystem এর পরিবর্তনের ফলে ইলিশ অবতরণের ধরণ পাল্টে গেছে- অথচ রিসোর্চ সার্ভে সিস্টেম এর ফ্রেম আগেরটিই (১৯৮৩-৮৪ সালের) আছে। **কিছু কিছু নমুনা গ্রাম আর নেই**। অনেক জেলে পেশা পরিবর্তন করেছে এবং কোথাও কোথাও **নতুন জেলের উদ্ভব ঘটেছে**। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের GEF কম্পোনেন্টের আওতায় ২০০২ সালে নমুনা নৌকা ও নমুনা গ্রামের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে যথাক্রমে প্রায় **৩৭.৫% এবং ৩৯.৬% জেলে নৌকা হ্রাস পেয়েছে**। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে যথাক্রমে **প্রায় ১২.৩৭% ও ৩৮.৬৭% জেলে নৌকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত ৬০ টি গ্রামের মধ্যে ৯টি গ্রাম খোঁজ করে পাওয়া যায়নি**। এ প্রেক্ষাপটে জেলে গ্রাম ও নৌকার সংখ্যা হালনাগাদ করা অতীব জরুরী;

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহের জন্য মৎস্য সম্পদ জরিপ বিভাগের জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত সীমিত। উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সারা দেশে ৬৩টি জরিপ কর্মকর্তার পদ থাকলেও কয়েকটি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য আছে। মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহের জন্য আর্থিক সাপোর্টও অত্যন্ত কম। ফলে জরিপ কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা অনেক সময়ই সংগ্রহ করতে পারেন না।

বর্তমান পদ্ধতি উন্নয়নের কৌশল

- শুধুমাত্র ইলিশ মাছের উৎপাদন পরিবীক্ষণের জন্য একটি মডেল তৈরী করা;
- নমুনা গ্রাম ও মাছ ধরার এককের সংখ্যা পূনঃ জরিপ করে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ;
- নমুনার আকার প্রয়োজন অনুসারে বড় করা;
- মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে গৃহীত তথ্য মান সম্পন্ন, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়;
- মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতির জন্য মাঠ পর্যায়ে লোকবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;
- তথ্য সংগ্রহের কাজে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদেরকে জরিপ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৭. ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম, জাল ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশে প্রায় সারা **বৎসর কমবেশী ইলিশ মাছ ধরা পড়ে**। তবে ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম হচ্ছে প্রতি বৎসর **আগষ্ঠ হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত**। এ তিন মাসে গড়ে প্রায় ৬০% ইলিশ মাছ ধরা পড়ে (চিত্র-৪)। ইলিশ মাছ ধরার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৌসুম হচ্ছে মে-জুলাই মাস। ইলিশ মাছ ধরার এলাকা এবং মৌসুম ভেদে ব্যবহৃত জাল ও যন্ত্রপাতি (নৌকা) ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইলিশ মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও বহুল ব্যবহৃত জাল হচ্ছে drift ও set gill net। অধিকাংশ জাল কৃত্রিম আঁশ (Synthetic fibre) দিয়ে তৈরী। জাল তৈরীর সুতা এক তন্তু (Monofilament) ও বহু তন্তু বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বর্তমানে সুতার জাল প্রায় ব্যবহার হয়না বলা চলে। উপরোক্ত জাল ছাড়াও কখন কখনও বেহুন্দি জাল (set bagnet), খরা বা ভেসাল জালেও ইলিশ মাছ ধরা পড়ে।

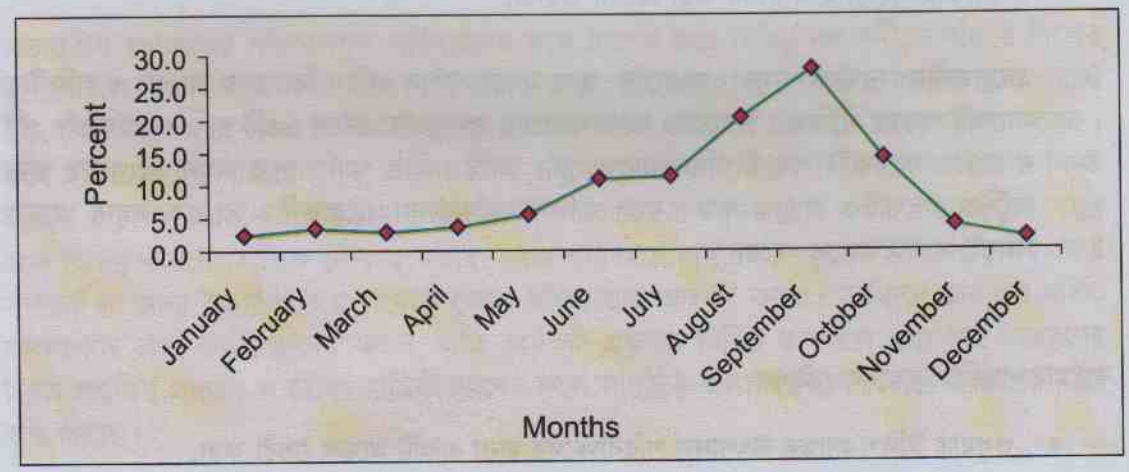

চিত্র-৪: বরিশালস্থ পাইকারি বাজারে ১৯৮৫-২০০২ ইং সালের মাসওয়ারী গড় ইলিশ অবতরণ

৮. ইলিশ মাছের জীববিদ্যা

ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ ও জীবন চক্র

ইলিশ মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রের লবনাক্ত পানি হতে মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে সমুদ্রে চলাচল করে থাকে। এ মাছের অটোলিথের ক্ষুদ্র মৌলের বিন্যাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে **সাগরের ইলিশ মিঠা পানিতে** এবং **মিঠা পানি হতে একই মাছ সাগরে পরিভ্রমণের** সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া গিয়েছে। তবে ইলিশ মাছের স্কুলিং সাধারণতঃ উপকূলীয় এলাকায় হয়। এ মাছ নদ-নদীর প্রায় ১২০০-১৩০০

কি:মি: উর্দ্ধেও পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং কয়েকটি বড় নদীতে **ইলিশ স্থায়ীভাবে বসবাস করে**। ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত সাতাঁর কেটে থাকে। দিনে প্রায় ৭১ কি:মি: পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে। বিভিন্ন পরিবেশে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ এবং জীবনচক্র নিম্নের চিত্র-৫ দেখানো হলো।

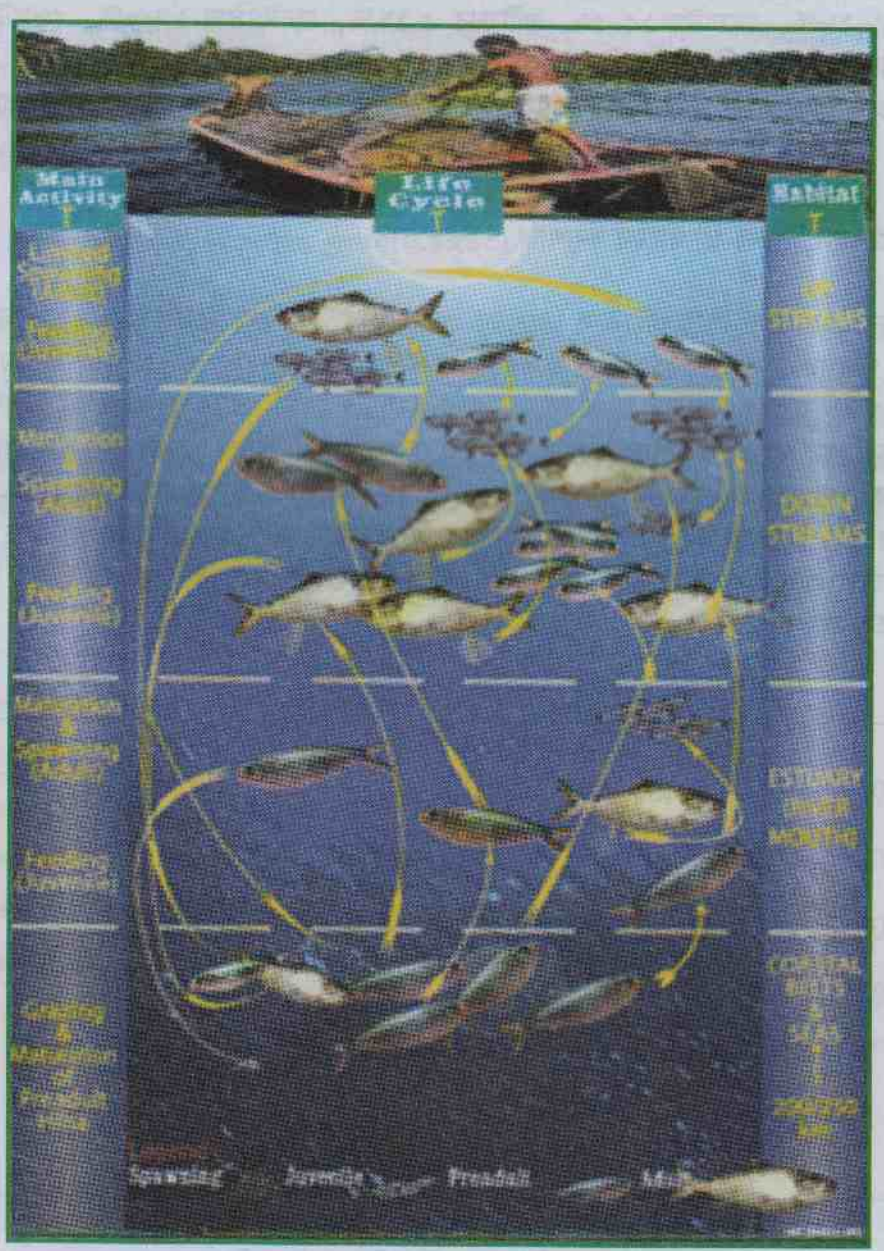

চিত্র-৫: ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ ও জীবন চক্র

ইলিশ মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ইলিশ মাছ মূলতঃ প্লাঙ্কটন ভোজী। ইলিশ মাছের গিল র‍্যাকার প্রায় চালুনির মত। তাই খাদ্যের তালিকায় বিশেষ কোন নৈর্বাচনিকতা নেই। ইলিশ মাছের খাদ্য তালিকায় অ্যালজি-৪১.৬৫%, বালুকণা-৩৬.২৮%, ডায়াটম-১৫.৩৬, রটিফার-৩.১৯%, ক্রাষ্টাসিয়া-১.৮৯%, প্রোটোজোয়া-১.২২% এবং অন্যান্য মিশ্র দ্রব্যাদি-০.৪১% পাওয়া গিয়েছে। ইলিশ মাছের আকার, বয়স ও পরিবেশ ভেদে খাদ্য গ্রহণ মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে। প্রজনন ঋতুতে খাদ্য গ্রহণ থেকে প্রায় বিরত থাকে।

পরিপক্কতার বয়স, পুরুষ-স্ত্রী মাছের অনুপাত (Sex-ratio)

ইলিশ মাছের গোনাডের হিষ্টোলজিকাল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ১$^{+}$ বৎসর বয়সে ইলিশ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে। স্থান, সময় ও দৈর্ঘ্য ভেদে **পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত ভিন্ন হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত প্রায় সমান (১:১) থাকে**। সাধারণতঃ ৪২-৪৫ সে:মি: এর চেয়ে বড় **অধিকাংশ ইলিশ মাছই স্ত্রী** (চিত্র-৬) এবং ২০-২৫ সে: মি: **দৈর্ঘ্যের অধিকাংশ মাছই পুরুষ**। এ প্রেক্ষিতে বড় আকারের বা স্ত্রী মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণে ডিম পাওয়া যেতে পারে যা ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

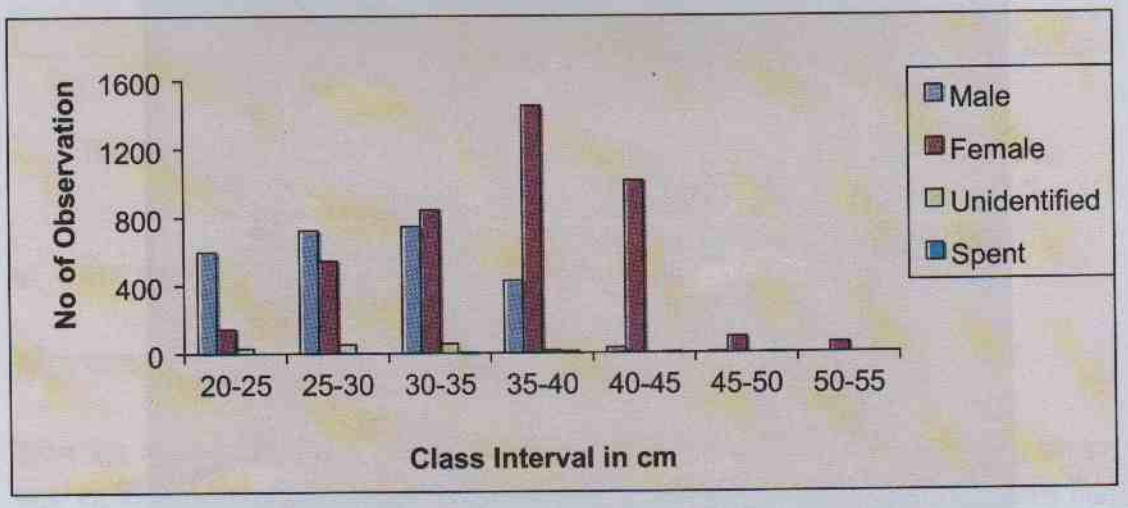

চিত্র-৬: দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছ প্রাপ্তির সংখ্যা

ইলিশের ডিম ধারণ ক্ষমতা (Fecundity)

ইলিশ মাছের বয়স ও আকারভেদে ডিম ধারণ ক্ষমতার **তারতম্য হয়ে থাকে**। পরিপক্ক ইলিশ মাছের ডিমের পরিমাণ ১.০-২০.০ লক্ষ। **দুই বছরের অধিক বয়সের ইলিশ সবচেয়ে বেশী ডিম ধারণ করে থাকে**। এ প্রেক্ষিতে বড় আকারের ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক ভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে ডিম বা ইলিশ মাছের পোনা পাওয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, ইলিশ মাছের **ডিম ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ইহা একটি উদ্বেগজনক বিষয়**। নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, পানি দুষণসহ নানাবিধ কারণে ইলিশের ডিম ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। গবেষণার মাধ্যমে **ডিম ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ নির্ণয় অতীব জরুরী**।

ইলিশ মাছের প্রজনন কাল ও সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম

ইলিশ মাছ **প্রায় সারা বৎসর কম-বেশী প্রজনন করে থাকে**। তবে ইলিশ মাছের পরিপক্কতার মাত্রা, গোনাডোসোমেটিক সূচি (চিত্র-৭), প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ এবং প্রজননোত্তর মাছ (Spent fish) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দু'টি উচ্চ প্রজনন মৌসুম যথা: **সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস সর্বোচ্চ এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নিরূপণ করা হয়েছে। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার ৫ দিন আগে এবং ৫ দিন পরে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ইলিশ মাছ ডিম ছেড়ে থাকে**।

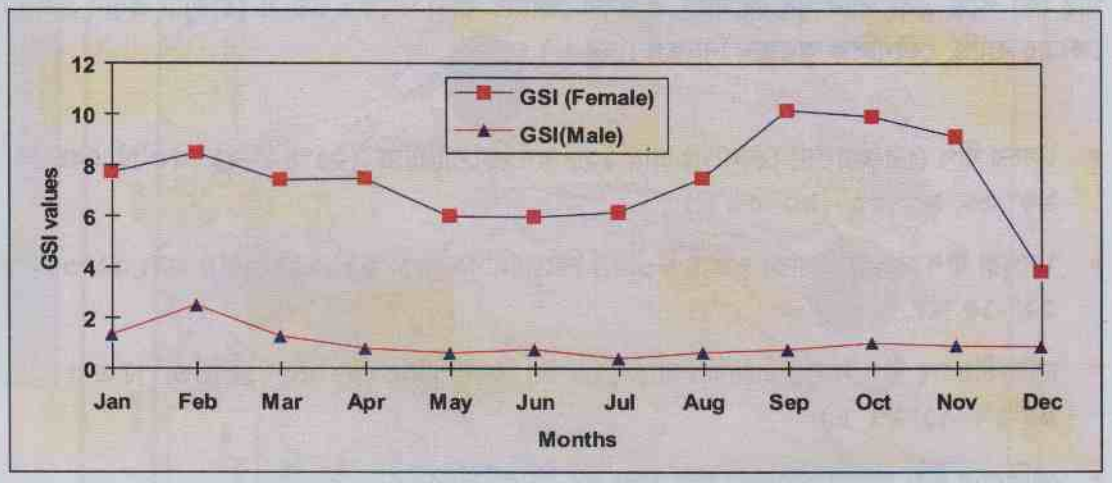

চিত্র-৭: ইলিশ মাছের গড় জি এস আই মান

প্রজননের সময় ও প্রজননের পৌনঃপুনিকতা ঃ (Spawning frequency)

ইলিশ মাছ একবারেই সফল প্রজনন করে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন যে ইলিশ মাছ তার ডিম্বকোষের **সকল ডিম একবারে ছেড়ে দেয়না**। এমনকি তাদের ডিম্বকোষের সকল ডিম একসাথে পরিপক্কও হয়না। তাই একই ইলিশ মাছ একাধিকবার ডিম ছাড়তে পারে বলে ধারণা করা হয়। ইলিশ মাছ সাধারণত: সন্ধ্যাকালীন সময়ে ডিম ছাড়ে। পানির তাপমাত্রার উপর নিষিক্ত ডিম হতে রেনুপোনা উৎপাদিত হওয়ার সময় নির্ভর করে। সাধারণতঃ ১২ হতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে।

৯. ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ও প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা

প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের প্রায় **সকল প্রধান প্রধান নদ-নদী, মোহনা এবং উপকুলীয় এলাকায় ডিম ছেড়ে থাকে**। তবে বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে **মেঘনা নদীর ঢলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলভীর চর ও কালির চরের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে**। এ সকল এলাকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পরিপক্ক ও ডিম নির্গত অবস্থার মাছ সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় প্রবেশ করে। অন্যান্য সময় এখানে ইলিশ মাছের এত ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায় না। জেলেদের হাতে এ সময় প্রচুর পরিমাণে ডিম নির্গত অবস্থার ইলিশ মাছ ধরা পড়ে এবং পানি খুব ঘোলাটে ও প্রবল জোয়ার-ভাটা থাকে। উক্ত ৪ (চার)টি প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি, ভৌগলিক অবস্থান নিম্নরূপ (চিত্র-৮) ঃ

- ঢলচর দ্বীপ (চর ফ্যাশন, ভোলা) ঃ প্রায় ১২৫ বর্গ কিলোমিটার (২১°৪২'-২১° ৫৫'N এবং ৯০° ২০, ৯০° ৫৩'- ৯০° ৫০'E)
- মনপুরা দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা ঃ প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার (৯১° ১২'-৯১°-২০'E এবং ২২°০০-২২°-১৫'N)
- মৌলভীর চর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকাঃ প্রায় ১২০ বর্গ কিলোমিটার (২১°৫৩'-১২°০৩ ' N এবং ৯১°১৭'-৯১°২৭' E)
- কালিরচর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকাঃ প্রায় ১৯৪ বর্গ কিলোমিটার

চিত্র-৮: বাংলাদেশে ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র

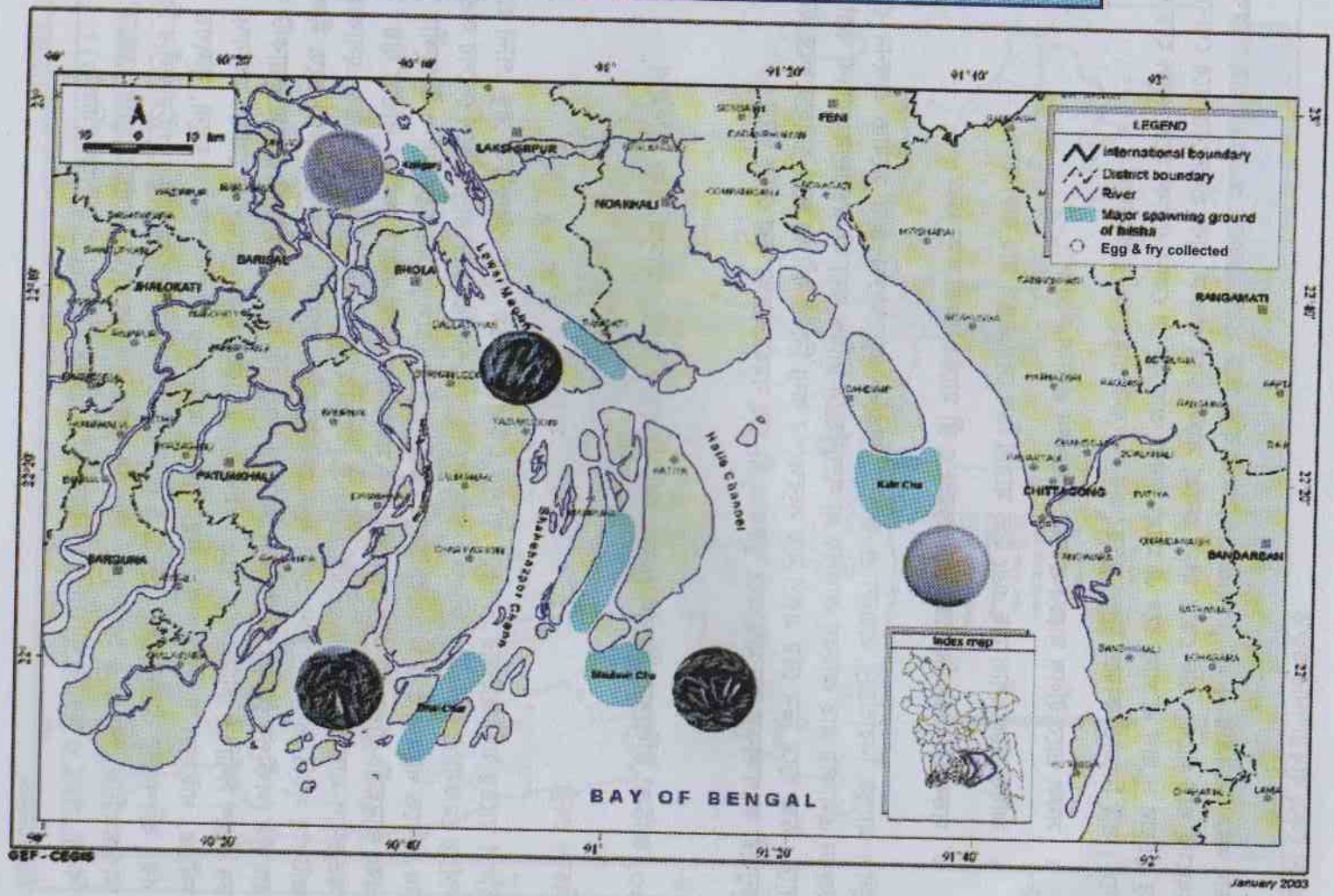

প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

কোন মৎস্য জনতার (Fish population) বংশ বৃদ্ধি তার সফল প্রজনন ও পোনা মাছ সংরক্ষণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। যদি কোন মৎস্য জনতা সফল ভাবে প্রজনন এবং প্রজননের পরে পোনা মাছ বড় হওয়ার সুযোগ না পায় তবে ঐ মৎস্য জনতা অচিরেই যে কোন এলাকা হতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নিম্নোক্ত কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ঃ

- সফল ভাবে ইলিশ মাছের প্রজনন ও প্রজনন এলাকা সংরক্ষণ;
- অধিক প্রজননশীল মাছ এবং উচ্চ মাত্রায় ডিম দেয় এরূপ মাছ রক্ষা করা;
- সফলভাবে ডিম নিষিক্তের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী মাছের সমতা রক্ষা করা।

ইলিশ মাছের নিরবিচ্ছিন্ন প্রজনন ও প্রজনন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রজনন এলাকায় মাছ আহরণ আংশিক বা **সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ করা বা অভয়াশ্রম ঘোষণা করা যেতে পারে।** উচ্চ হারে ডিম দেয় এরূপ মাছ সংরক্ষণের **জন্য নির্দিষ্ঠ ফাঁসের জাল ব্যবহার করে প্রয়োজন অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত বড় মাছ এবং পুরুষ ও স্ত্রী-মাছ সমহারে রক্ষা করা যেতে পারে।**

১০. জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র, জাটকা ধরার জাল, মৌসুম এবং পরিমাণ

বিচরণ ক্ষেত্র

ইলিশ মাছের মত জাটকার বিস্তৃতি ব্যাপক। ইলিশের ডিম হতে পরিস্ফুটিত রেণু পোনা প্রাথমিক পর্যায়ে মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিচরণ করে। অত:পর কিছুটা বয়োপ্রাপ্ত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে খাদ্যের জন্য অভিপ্রয়াণ করে। তাই **নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মোহনা ও উপকুলীয় অঞ্চলে এবং জানুয়ারী-এপ্রিল/মে মাসে দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে জাটকা পাওয়া যায়।** দেশের অভ্যন্তরীণ প্রায় ১০০টি নদ-নদীতে জাটকার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে উক্ত এলাকার মধ্যে জাটকার দুইটি প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র যথা **মেঘনা নদীর ষাটনল (চাঁদপুর জেলা) হতে নীলকমল-রামগতি (লক্ষীপুর জেলা) অংশে** এবং **ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী মাসে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা দুবলার চর অংশে সর্বাধিক জাটকা ধরা পড়ে।** মেঘনা অববাহিকা ছাড়াও রাজশাহী জেলার মহানন্দা ও পদ্মা নদীতে, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা, মানিকগঞ্জ জেলার পদ্মা ও যমুনা, মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা, বরিশালের কীর্তনখোলা, ইলিশা ও কারখানা, ভোলা জেলার তেতুলিয়া, পটুয়াখালীর বিষখালী, আন্ধারমানিক, পায়রা ও আগুনমুখা, বরগুনার বুড়িশ্বর, বাগেরহাটের বলেশ্বর, খুলনা জেলার রূপসা, শিবসা, পশুর ও অন্যান্য নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাটকা পাওয়া যায় (চিত্র-৯)।

চিত্র-৯: বাংলাদেশে জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র

জাটকা ধরার বিভিন্ন জাল

জাটকা ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার জালের **মধ্যে জগৎ বেড় জাল, বেড়জাল, ফাঁস বা কারেন্ট জাল, পোয়া জাল, বেহুন্দী জাল** প্রভৃতি প্রধান। বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জালে **শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, কারেন্ট জালে শতকরা ৪০ ভাগ** এবং বেহুন্দী সহ অন্যান্য জালে শতকরা ১০ ভাগ জাটকা ধরা পড়ে।

জাটকা ধরার মৌসুম

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় কম বেশী প্রায় সারা বৎসরই জাটকা পাওয়া যায়। তবে জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম জানুয়ারী হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কোন কোন বৎসর জাটকা ধরার মৌসুম মে মাস পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। সাধারণতঃ এপ্রিল/মে মাসে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য কারণে নদীর পানি ঘোলা হওয়ার পর আর তেমন জাটকা পাওয়া যায় না। জাটকার আধিক্য ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে ডিম হতে পরিস্ফুটিত ইলিশ মাছের ছোট পোনা নভেম্বর-ডিসেম্বর/জানুয়ারী মাসে উপকূলীয় এলাকায় বিচরণ করে। অতঃপর কিছুটা বড় হলে এরা নদীর উপরের দিকে বিস্তার করে ৫–৭.৫ সে.মি. (২-৩") আকারের হলে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস হতে বিভিন্ন নদ-নদীতে ধরা পড়ে এবং এপ্রিল/মে মাস পর্যন্ত তাদের আধিক্য থাকে। বাংলাদেশে মাসওয়ারী ধৃত জাটকার পরিমাণ চিত্র-১০ এ দেখানো হলোঃ-

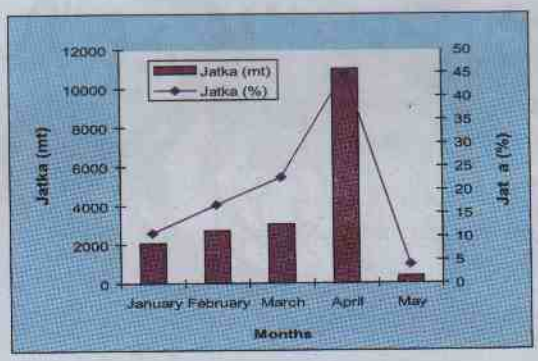

চিত্র-১০: বাংলাদেশে মাসওয়ারী জাটকা নিধনের পরিমাণ (টনে) (১৯৯২-৯৪)

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় বাংলাদেশে মোট ধৃত জাটকার প্রায় ৪০-৪৫% এপ্রিল মাসে এবং ১০-১৫% মার্চ মাসে অর্থাৎ মোট ধৃত জাটকার ৫০-৬০ ভাগ এ দুই মাসে ধরা পড়ে। অপর দিকে উপকূলীয় এলাকায় জাটকা মাছের প্রাধান্য নভেম্বর হতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত থাকে এবং জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে।

জাটকা ধরার পরিমাণ

বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের প্রাথমিক হিসাব অনুযারী বিগত ২০০০ সালে প্রায় ১৯,৩০০ মে: টন জাটকা ধরা হয়েছিল (সারণী-১)। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকার মধ্যে **প্রায় ৯৫% জাটকা নিম্ন মেঘনা হতে, ২.৭৫% উর্ধ্ব ও নিম্ন পদ্মা নদীতে, প্রায় ১.০৫% খুলনা অঞ্চল** হতে এবং অবশিষ্ঠ পরিমাণ বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে ধরা পড়ে। এত ব্যাপক পরিমাণ জাটকা ধরার ফলে ইলিশ মাছের পুন:সংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া, জাটকা ধরার জন্য ইলিশ মাছের Growth over-fishing হচ্ছে। ফলে ইলিশের বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। **ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা নিধন বন্ধ করা অত্যাবশ্যক**।

সারণী-১ ঃ জেলাওয়ারী জাটকা ধরার হিসাব (২০০০ সাল)

জেলার নাম	প্রধান প্রধান নদীর নাম	ধৃত জাটকার পরিমাণ (মেঃ টন)
চাঁদপুর, লক্ষীপুর	নিম্ন মেঘনা	১৮,৪০৩.০০
রাজশাহী, পাবনা	উর্ধ্ব পদ্মা	৬৬.০৪
রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ	নিম্ন পদ্মা	৪৬৬.২০
বরিশাল	তেতুলিয়া, কীর্তনখোলা, কারখানা	৪৩.২০
খুলনা	রূপসা, শিপসা ও পশুর	২০২.০০
পটুয়াখালী	গলাচিপা, আন্দারমানিক, পায়রা	৩০.৬০
বরগুনা	বিষখালী, বুড়িশ্বর, কূয়াকাটা	৪৭.২৮
	মোট	১৯,২৫৮.৩২

উৎসঃ বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর।

১১. জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়

আমাদের দেশে ৯" বা ২৩ সে:মি: আকার পর্যন্ত কিশোর ইলিশকে জাটকা বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে জাটকা ও চাপিলা মাছ দেখতে প্রায় একই রকম হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে উভয় প্রকার মাছের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় জেলে এবং মাছ ব্যবসায়ীগণ **জাটকা মাছকে চাপিলা বলে সকলকে বিভ্রান্ত করে থাকে**। জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য সনাক্তকরণে দক্ষতা না থাকলে মৎস্য সংরক্ষণ আইন (হিলশা) বাস্তবায়নে যথেষ্ঠ অসুবিধা দেখা দেয়। বাস্তবে চাপিলা ও জাটকা দুইটি পৃথক গণের মাছ। জাটকা ও চাপিলা মাছ সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য এবং চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য

জাটকা	চাপিলা
১। ইলিশ বা জাটকা Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের *Tenualosa* গণভুক্ত	১। চাপিলা মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারে *Gudusia* ও *Gonialosa* গণভুক্ত
২। জাটকা মাছের পিঠের ও পেটের দিক প্রায় সমভাবে উত্তল	২। চাপিলা মাছের পিঠের চেয়ে পেটের দিক অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তল ও প্রশস্ত
৩। চাপিলার তুলনায় জাটকার দেহ পার্শ্বীয় ভাবে পুরু	৩। চাপিলার দেহ পার্শ্বীয় ভাবে পাতলা
৪। আঁইশের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়, নিয়মিত সারিতে সাজানো এবং পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৪০-৫০	৪। আঁইশের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট, পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৮০-১২০
৫। চোখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট, এডিপোজ লিড থাকে	৫। চোখের আকৃতি এবং এডিপোজ লিড অপেক্ষাকৃত বড়
৬। মাথার আকৃতি লম্বাটে ও অগ্রভাগ সূচালো	৬। মাথার আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট ও অগ্রভাগ ভোঁতা
৭। মুখ টারমিনাল, ঠোঁট কিছুটা পুরু, চোয়াল প্রায় সমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায় না	৭। মুখ উপরের দিকে উঠানো (upturned), ঠোঁট পাতলা, চোয়াল অসমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়

জাটকা	চাপিলা
৮। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৫-১৬টি এবং পোষ্ট পেলভিক ১১-১৬ টি (মোট ৩০-৩৩ টি)	৮। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৮-১৯ টি এবং পোষ্ট পেলভিক ৮-১০ টি (মোট ২৬-২৯ টি)
৯। পৃষ্ট পাখনা বক্ষ পাখনার সামান্য সম্মুখে এবং ১১-১৬ টি শাখাযুক্ত (branched) রে (rays) থাকে	৯। পৃষ্ট পাখনা বক্ষ পাখনার সোজাসুজি উপড়ে এবং ১৬ টি শাখা যুক্ত রে (rays) থাকে
১০। পায়ু পাখনার সংখ্যা ১৪-২৪ টি	১০। পায়ু পাখনার সংখ্যা ২১-২৪ টি
১১। গিল ওপেনিং এর পরে একটি বড় কালো ফোটা এবং পরে অনেকগুলো ফোটা থাকে	১১। চাপিলা মাছে অনেক সময় ফোটা থাকে, অনেক সময় থাকে না
১২। তাজা (Fresh) জাটকা মাছের গন্ধ ইলিশ মাছের গন্ধের মত	১২। চাপিলা মাছের গন্ধ ইলিশ মাছের মত নয়
১৩। জাটকা বা ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ-৮৪.২%; ফর্ক-৮৭.৮%; প্রিএনাল- ৫৯.৮%; প্রিডরসাল-৩৬.১%; প্রিপেলভিক-৩৭.৬%; প্রিপেকটোরাল-২২.৪%; বডি ডেপথ্ ২৭.৫%; হেড-২২.০% এবং প্রিঅরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার হেডলেন্থ এর যথাক্রমে ১৬.৯ ও ১৯.২%।	১৩। চাপিলা মাছের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য-৭৯.৭%; ফর্ক- ৮৬.২%; প্রিএনাল-৫৫.৫%; প্রিডরসাল-৩৮.০%; প্রি-পেলভিক ৩৭.৫%; প্রি-পেকটোরাল-১৯.৬%; বডি ডেপথ্-২৭.৭%; হেড-২১.৯% এবং আই ডায়ামিটার ও প্রি-অরবিটাল লেন্থ হেডলেন্থ এর যথাক্রমে ২৮.০ ও ১৭.৬%।

জাটকা মাছ

চাপিলা মাছ

১২. ইলিশ মাছের মজুদ (Stock) নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা, ফলাফল, ফলাফলের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা

মজুদ (Stock) নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

মজুদ বলতে কোন **একটি প্রজাতির এক গুচ্ছ মাছকে বুঝায়** (A subset of one species) যাদের বৃদ্ধি, মৃত্যুহার, প্রজনন ও অনান্য Taxonomic বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং এক বা একাধিক ভৌগলিক এলাকাতে বসবাস করে। একটি মজুদের সকল মাছের **সাধারণ বংশগত বৈশিষ্ট্য** (Common gene pool) থাকে। কাসিং (১৯৬৮) এর মতে মজুদ হচ্ছে কোন একটি প্রজাতির এক গুচ্ছ মাছ **যাদের একটি প্রজনন গ্রুপ** (Single spawning group) থাকে এবং যাতে **প্রাপ্ত বয়স্ক মাছ বৎসরের পর বৎসর যোগদান বা প্রবেশন করে থাকে।**

জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যু এবং আহরণজনিত মৃত্যু হয়ে থাকে। মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও **আহরণজনিত মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।** মাছের প্রবেশন এবং আহরণজনিত মৃত্যুহারের মধ্যে সমতা (Balance) **রক্ষা না করে অতিরিক্ত আহরণ করা হলে যে কোন পপুলেশন বা ষ্টক ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।** আবার সমতা রক্ষা করে **কোন ষ্টক হতে বৎসরের পর বৎসর সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভ করা সম্ভব।** মজুদ নিরূপণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আহরণজনিত মৃত্যুহার এবং প্রাকৃতিক মৃত্যুহারের মধ্যে সমতা রক্ষা করে যে কোন স্টক হতে সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভ এবং ঐ ষ্টকের ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ণয় করা।

মজুদ নিরূপণের ধারণাটি **মাছের বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।** কোন ষ্টকের সকল **মাছের বৃদ্ধি ও মৃত্যু** যে কোন এলাকার জন্য একটি **নির্দিষ্ট হারে** (Constant) থাকে। এ প্রেক্ষাপটে, মাছের ঐ মজুদের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার, আহরণজনিত মৃত্যুহার, প্রবেশন (Recruitment), বৃদ্ধির বয়স ও হার এবং প্রথম ধরার বয়স ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোকে **ইল্ড পার রিক্রুট, বায়োমাস** (Biomass), **সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন** (Maximum sustainable yield) ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে **মাছ ধরার প্রচেষ্টা** (Fishing effort), **মাছ ধরার জালের নৈর্বাচনিকতা** (Gear selectivity), **উৎপাদন ও জৈবিক পদ্ধতি** (Biological process) ইত্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে **ষ্টকের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়।**

ইলিশ মাছের মজুদ নির্ণয়ের ফলাফল ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা

বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুরে ১৯৯২ সাল হতে ইলিশ মাছের ষ্টক এসেসমেন্ট করা হচ্ছে। নিম্নের সারণী-২ এ প্রাপ্ত ফলাফল প্রদান করা হলো ঃ-

সারণী-২ঃ ইলিশ মাছের ষ্টক এসেসমেন্ট এর ফলাফল

প্যারামিটার	বৎসর ও ফলাফল						
	১৯৯২	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (L_∞)	৬১.১	৫৮.৩	৫৯.৯৭	৬১.৫০	৬৬.০০	৬০.০০	৬২.৫০
বৃদ্ধির সহগ (K)/বছর	০.৭৪	০.৭৪	০.৯৯	০.৮৩	০.৬৭	০.৮২	০.৭২
মোট মৃত্যুহার (Z)/বছর	২.৪১	২.৬১	৩.১৯	৩.২৯	৩.৪৩	৩.৭৭	২.৭৯
প্রাকৃতিক মৃত্যুহার (M)/ বছর	১.১৬	১.১৮	১.৪১	১.২৮	১.২৫	১.২৮	১.১৭
আহরণ জনিত মৃত্যুহার (F)/বছর	১.২৫	১.৪৩	১.৭৮	**২.০১**	**২.১৮**	**২.৪৯**	১.৬২
আহরণ মাত্রা (E)	০.৫২	০.৫৫	০.৫৬	**০.৬১**	**০.৬৩**	**০.৬৬**	**০.৫৮**
সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা (Emax)	-	-	-	-	**০.৬০**	**০.৫৯**	**০.৪৬**
প্রথম ধরার দৈর্ঘ্য (Lc) সে:মি:	৩৫.০	৩০.০	৩০.৩৪	৩০.২৫	**২৭.০৬**	**২২.৮০**	**১৩.১২**
বৃদ্ধির মাত্রা (∅)	-	৩.৪০	৩.৫৫	৩.৫০	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৫

উপরের সারণী-২ হতে দেখা যায়, বিগত ১৯৯২ এবং ১৯৯৫ হতে ২০০০ সালে মাছের তাত্ত্বিক **সহনশীল আহরণ মাত্রার (০.৫০)** চেয়ে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ উচ্চ মাত্রায় আহৃত হয়েছে। উক্ত বৎসর সমূহে সর্বনিম্ন আহরণ মাত্রা (E) ছিল ০.৫২, এবং ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে সর্বোচ্চ যথাক্রমে ০.৬৩, ০.৬৬ ও ০.৫৮। অর্থাৎ উক্ত বৎসর সমূহে তাত্ত্বিক সহনশীল মাত্রার (E) চেয়ে ০.১৩ হতে ০.১৬ বা শতকরা ২৬, ৩২ ও ১৬ ভাগ পর্যন্ত বেশী মাত্রার ইলিশ মাছ ধরা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা (E_{max}) ছিল যথাক্রমে ০.৬০, ০.৫৯ ও ০.৪৬ অর্থাৎ বিগত ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ সর্বোচ্চ **আহরণ মাত্রার চেয়ে বেশী পরিমাণ ধরা হয়েছে**। উক্ত বৎসর সমূহে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার (M) কমবেশী প্রায় একই রূপ (১.১৬ হতে ১.২৮) থাকলেও ১৯৯২ সালের আহরণ জনিত মৃত্যুহার (F) **১.২৫ হতে ১৯৯৯**

সালে ২.৪৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ধরার প্রচেষ্টা (Fishing effort) ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ **ধরার প্রথম দৈর্ঘ্য** (L_c) **৩৫.০ সেঃ মিঃ** হতে হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ***১৩.১২ সেঃ মিঃ*** এ উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন পাবার **প্রমিত (Standard) আকারের (৩১.০ সেঃ মিঃ) চেয়ে ছোট মাছ আহৃত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপট অত্যন্ত উদ্বেগজনক।** ছোট আকারের ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করা সহ অতিআহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইলিশ ষ্টকের **ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।**

১৩. ইল্ড পার রিক্রুট (Y/R), ইলিশ মাছের প্রথম ধরার বয়স ও আহরণ মাত্রার সম্পর্ক

কোন মৎস্য কূলের সাথে প্রতি বছর ধরার যোগ্য নবীন মাছ নতুন ভাবে সংযোজন হওয়ার প্রাকৃতিক **প্রক্রিয়াকে প্রবেশন (recruitment) বলা হয়।** কোন মৎস্য জনতায় প্রতি বৎসর গড়ে একক মাছ (Unit fish) থেকে যে পরিমাণ উৎপাদনের (yield) সংযোজন ঘটে **তাকে ইল্ড পার রিক্রুট** (yield per recruit) বলা হয়। ইহাকে সংক্ষেপে Y/R দ্বারা এবং Y/R এর মান গ্রামে প্রকাশিত হয়ে থাকে। Y/R একটি চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া। Y/R একটি উৎপাদন সূচক (Y/R is a production index of any fish population in the open water system)। Y/R এর মানই হলো **উৎপাদনের মাপকাঠি, যার মাধ্যমে উক্ত মৎস্য জনতার উৎপাদনের বর্তমান ও ভবিষৎ উৎপাদন সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়।**

মুক্ত জলাশয়ের কোন মৎস্য জনতার উৎপাদনের একক (Y/R) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছ ধরার প্রথম বয়স (Tc) এবং আহরণ জনীত মৃত্যুহার (F) এর উপর নির্ভরশীল। Tc এবং F এর সমন্বয়ে মাছ আহরণ করা হলে সর্বোচ্চ Y/R দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তীত থাকে (Sparre and Venema, 1992)। উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে বিগত ১৯৯৫ সালের মেঘনা নদীর ইলিশ জনতার Tc এবং F এর সমন্বয় বিশ্লেষণ করে সর্বোচ্চ Y/R = **২০১.৯০ হতে ২১০.১৫ গ্রাম পাওয়া যায় যখন Tc = ১.৭ হতে ১.৯ বৎসর বা ৩২ হতে ৩৫সে.মি. এবং F এর মান এ ক্ষেত্রে ২.০ হতে ৩.৬ প্রতি বৎসর।** উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় Y/R এর মান **কমপক্ষে ২০০ গ্রাম পেতে হলে ইলিশ মাছের প্রথম ধরার বয়স, Tc = ১.৭ বৎসর বা ৩২.০ সেঃমিঃ হওয়া আবশ্যক।** Tc এর মান ১.৭ হলে Y/R দীর্ঘকাল ধরে সর্বোচ্চ পাওয়া সম্ভব হবে এবং আহরণ **মাত্রা ৩.৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।** অর্থাৎ বর্তমানে ইলিশ মাছ ধরায় নিয়োজিত জেলে সংখ্যার চেয়েও বেশী সংখ্যক জেলে মাছ ধরায় নিয়োজিত হতে পারবে। এমতাবস্থায় **আহরণ মাত্রাকে ২.০ এর** মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে অথবা **প্রথম ধরার বয়স (Tc) ১.৭ করা সম্ভব হলে Y/R এর মান ২০১.৯০ হতে ২১০.১৫ গ্রাম হবে।** ফলে দীর্ঘকাল ব্যাপী ইলিশের সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যাবে।

১৪. বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল

সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে অবাধে ইলিশ মাছ আহরণ করার ফলে এ মাছের **প্রাকৃতিক ভাবে ডিম তথা পোনা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে**। ব্যাপক ভাবে জাটকা ধরার ফলে এ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন, জাটকাকে বৃদ্ধির সময় না দিয়ে ধরার ফলে **গ্রোথ ওভার ফিসিং** এবং পূর্ণ বয়স্ক মাছকে রক্ষা না করার ফলে **রিক্রুটমেন্ট ওভার ফিসিং হচ্ছে**। ইলিশ মাছের জীবনচক্রের প্রায় **সকল স্তরে আহরণ জনিত মৃত্যু হচ্ছে**। এছাড়া বিভিন্ন কারণে নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং জলজ দূষণের জন্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ইলিশ মাছের **অনেক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র এবং জাটকা ইলিশের চারণ ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেছে**। এ সম্পদের **গুরুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রায় সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা অপ্রতুল**। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা এবং কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যকঃ

- অধিক ডিম/পোনা উৎপাদনের জন্য ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি;
- জাটকা সংরক্ষণ করা;
- ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
- ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা;
- সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;
- ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয় পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া;
- ইলিশ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে জনবল জোরদার করা;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া;
- ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরী ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

১৫. ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১৫.১ ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি

আমাদের দেশে প্রায় সারা বৎসর ইলিশ মাছ ধরা হলেও প্রতিবৎসর **আগষ্ট হতে অক্টোবর** মাসে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় **৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক থাকে** এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার জো এর সময় সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ডিম ছেড়ে থাকে। কাজেই প্রাকৃতিক ভাবে ইলিশ মাছের অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য **সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বড় পূর্ণিমার জোর সময়** প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে **কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক**। মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে উক্ত বড় পূর্ণিমার ১০ দিনের এক জো (১ হতে ১০ আশ্বিন পর্যন্ত) ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে।

১৫.২ জাটকা সংরক্ষণ

জাটকা হচ্ছে ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। তাই জাটকা ধরা হলে **ইলিশ মাছ লোপ পাবে** (Jatka caught, hilsa is lost)। জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য দেশে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন (হিলশা) বাস্তবায়ন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি নেভি, কোষ্ট গার্ড নিয়োজিত করা সহ আইন সংশোধন (কারেন্ট জাল উৎপাদন, বাজারজাত নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি) এবং আইন লংঘনকারীদের সাজার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে। আগামী বৎসর সমূহে সকল স্তরে উক্ত আইন বাস্তবায়ন **কার্যক্রম আরও জোরদার এবং কঠোর করা আবশ্যক**।

কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। জাটকা সহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য জাটকা মাছের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র **মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত এবং কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীতে যথাক্রমে প্রতি বৎসর মার্চ-এপ্রিল এবং নভেম্বর-জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণার উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে।**

১৫.৩ ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ

চন্দনা ইলিশ এবং হিলশা কেলি/কানাগুর্তা প্রজাতির আহরণ মাত্রা বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অভিমত। তাই ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার জন্য উক্ত দুইটি প্রজাতির আহরণ মাত্রা, বিস্তার ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা কাজ সম্পাদন করে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

১৫.৪ ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

সহনশীল মাত্রার চেয়ে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ প্রায় ৩০-৩৫% অতিরিক্ত আহরণ করা হচ্ছে। কোন প্রাকৃতিক পপুলেশন হতে অতিমাত্রায় মাছ আহরণ করা হলে উৎপাদনের গতিধারা সঠিক থাকে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে ঐ পপুলেশন **ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে**। অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক ঃ

- ফাঁস জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ জেলে ও মাছ ধরার নৌকা নিবন্ধীকরণ এবং নতুন জেলেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের দেশে প্রধানত: ফাঁস জাল দিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হয়। ফাঁসের আকার ভেদে বিভিন্ন আকারের ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে প্রাপ্ত জালের ফাঁস ও মাছের আকার সারণী-৩ এ' দেয়া হলো।

সারণী-৩: ইলিশ মাছ আহরণে ফাঁস জালের নৈর্বাচনিকতা এবং একক প্রচেষ্টায় মাছ ধরার পরিমাণ

জালের ফাঁসের আকার (সে:মি)	ধৃত পুরুষ মাছ		ধৃত স্ত্রী মাছ		জাল ব্যবহারের হার (Effort) %	একক প্রচেষ্টায় মাছ আহরণের পরিমাণ (কেজি/১০০০ মি: দৈর্ঘ্য জাল/ ঘন্টা)
	দৈর্ঘ্য (সে:মি:)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (সে:মি:)	সংখ্যা		
৬.০	২৫.৯ + ০.১৭	২৫৬	২৮.৭ + ০.৪৫	৬০	৭.৩১	০.৪৭ + ০.০২
৭.০	২৮.৩ + ০.২৯	২০৬	৩০.৪ + ০.৩১	১০২	১২.৩২	০.৩১ + ০.০৩
৮.০	৩১.৪ + ০.১৩	৩৯৯	৩২.৯ + ০.১২	৩৯৬	২৪.২০	০.২২ + ০.০১
৯.০	৩২.০ + ০.১০	২৫৩	৩৩.৬ + ০.১৩	৩২৮	১৮.৭২	০.২৯ + ০.০১
১০.০	৩৩.০ + ০.৩৪	৮৭	৩৬.১ + ০.১৫	৪৪৫	১৮.২৬	০.৪৫ + ০.০৩
১১.০	৩৬.৪ + ০.৩২	১০	৩৮.৭ + ০.৪০	১১৩	৮.৬৮	০.৫৬ + ০.০৬
১২.০	৩৫.৫ + ০.৬৪	১৩	৪২.৭ + ০.৪৪	৯৭	৭.৭৬	০.৬৩ + ০.১১
১৩.০	৩৮.০ + (১)	-	৪৪.৪ + ০.৪৪	৪০	২.৭৩	০.০২ + ০.৩৭

সারণী-৩ হতে দেখা যায় ৬.০ হতে ১৩ সে:মি: ফাঁসের জাল সাধারণত: ব্যবহার করা হলেও **৭.০ হতে ১০.০ সে:মি: ফাঁসের জালে সবচেয়ে বেশী মাছ (৮০-৯০%) ধরা পড়ে**। তবে ৫.০-৬.০ সে:মি: আকারের ফাঁসে অপেক্ষাকৃত **ছোট এবং পুরুষ মাছ** (২০.০ হতে ২৮.৭ সে:মি) ও ১২.০-১৩.০ সে:মি: আকারের ফাঁসে **সবচেয়ে বড় এবং অধিকাংশ স্ত্রী মাছ ধরা পড়ে**। এ প্রেক্ষাপটে অপেক্ষাকৃত **ছোট এবং বড় আকারের মাছ সংরক্ষণ সহ অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে ৮.০ হতে ১১.০ সে: মি: ফাঁসের ফাঁস জাল** ব্যবহারের প্রচলন করা যেতে পারে।

বর্তমানে ইলিশ জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করার কোন ব্যবস্থা নেই। **এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন**। এছাড়া দেশের সকল উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার অবাধ অধিকার পদ্ধতি (Open access) বলবৎ আছে। তাই জলাশয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পদ্ধতির পরিবর্তে **সমাজ ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করে** ইলিশ জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করত: নতুন জেলেদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং অতি আহরণ মাত্রা হ্রাস করা যেতে পারে।

১৫.৫ ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়

পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে দেশের বাইরে বিশেষ ভাবে ফারাক্কা বাঁধ এবং ভিতরে নানাবিধ বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলিভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশ মাছের ব্যাপক আবাসিক এলাকা ধ্বংশ এবং অভিপ্রয়াণ পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে **ফেণী, মুহুরি, কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধনু, কালি নদী, হুরাসাগর, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা ইত্যাদি নদীর ইলিশ মাছের আবাসস্থল সম্পূর্ণরূপে এবং গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মহানন্দা এবং পদ্মা নদীর উপরের অংশের আবাসস্থল প্রায় ধবংশের পথে**। প্রতি বৎসর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৫০০-৩,০০০ মে:টন কীটনাশক ধৌত হয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে পতিত হচ্ছে। কয়েক সহস্রাধিক শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বিষাক্ত বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশনের বর্জ্য সরাসরি বিভিন্ন নদ-নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় ফেলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ সহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য জলজ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী। ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ-

- নতুন কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ এবং নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ বা ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহনের পূর্বে **ইলিশ সম্পদের উপর এর প্রভাব বিবেচনা** করে **অভিপ্রয়াণ পথ** মুক্ত রাখা;

- ইলিশ ও অন্যান্য মাছের অভিপ্রয়াণ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য **ধলেশ্বরী, মধুমতি, গড়াই** ইত্যাদি নদী সমূহের **তলদেশ খনন করে সংস্কার** করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

- মৎস্য সম্পদ, নৌ-চলাচল, সেচ কার্যক্রমের জন্য **নদী শাসন ও পানি ব্যবহার** সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী এবং বাস্তবায়ন;

- পলিভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য **দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;**

- দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ **বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন নিষিদ্ধ করা;**

- পানি দূষণের ফলে মৎস্য **সেক্টরের ক্ষতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে** অবহিত করে একত্রে কাজ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে **ক্ষতিরোধক স্মারক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা;**

- জলজ পরিবেশ দূষণ মোকাবিলা করার জন্য ESCAP (১৯৮৮) প্রণীত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের অনুসরণ ও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

১৫.৬ ইলিশ মাছের গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি

ইলিশ মাছের গুরুত্ব এবং সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ যথেষ্ঠ সচেতন নন। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য সকল স্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনের সহযোগীতা প্রয়োজন বিধায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

১৫.৭ ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয়ের **মডেলটি অতি উত্তম হলেও সময়ের বিবর্তন ও জলজ পরিবেশের পরিবর্তনের** সাথে উহা **হালনাগাদ** (Update) করা হয়নি। ফলে ইলিশ উৎপাদন সূচকের সাথে বাজারে ইলিশ মাছের প্রাপ্যতা ও মূল্যের যথেষ্ঠ গড়মিল দেখা যায়। **সঠিক পরিকল্পনার জন্য সঠিক উৎপাদন পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই**। তাই ইলিশ সহ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ আহরণ পরিসংখ্যান নিরুপণ পদ্ধতি হালনাগাদ করা অতীব জরুরী। মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে ইলিশ মাছ আহরণ নিরূপণ পদ্ধতি উন্নয়নের কাজ ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে।

১৫.৮ প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন

ইলিশ একটি নবায়ন যোগ্য জলজ সম্পদ (Renewable aquatic resource)। ইলিশের জীবন চক্র বেশ জটিল। জলজ পরিবেশ সহ জলবায়ুগত উপাদানের উপর এ মাছের উৎপাদন নির্ভলশীল। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে উক্ত বিষয় সমূহ প্রতিনিয়ত **প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে**। পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তনের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য এবং জীবনবৃত্তে পরিবর্তন ঘটে থাকে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ সম্পাদন করা হলেও এ মাছের বহুবিধ বিষয় এখনও অজানা। এ প্রেক্ষাপটে এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক।

১৫.৯ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

ইলিশ মাছের ব্যাপ্তি অনেক বড়, আবাসস্থল বিস্তৃত এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিবেশগত উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সকল পরিবেশ ও পরিবেশগত উপাদান ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা- পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প অধিদপ্তর, কৃষি অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত। আবার ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্টান যথা- প্রশাসন, পুলিশ, নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড, আইন ও বিচার বিভাগ, চলচিত্র ও তথ্য, স্থানীয় সরকার প্রশাসন, ত্রান ও পুনর্বাসন, বনিক সমিতি, মৎস্যজীবি সমিতি, এনজিও ইত্যাদির সহযোগিতা প্রয়োজন। কাজেই ইলিশ মাছের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সম্পর্ক আরও নিবিড় করা প্রয়োজন।

১৫.১০ ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা

ইলিশ মাছ বঙ্গোপসাগরের **একটি অভিন্ন সম্পদ** (Common resource)। বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে ধৃত ইলিশ মাছ **একই মজুদ ভান্ডারের অংশ বিশেষ**। বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের গঙ্গা নদীর অববাহিকার হুগলী-মাতলা মোহনা অঞ্চল, গোদাবরী, দয়া ইত্যাদি নদীতেও ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র আছে এবং প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। কাজেই ইলিশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় এক দেশ এ মাছ সংরক্ষণের কাজ করে যাবে আর অন্য দেশ অতি আহরণে রত হলে আন্ত:দেশীয় কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। সাগর অঞ্চলে ইলিশ মাছের মজুদ বৃদ্ধির জন্য **নো-টেক জোন বা অভয়াশ্রম ঘোষণা,** যৌথ গবেষণা, পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ, পরস্পর তথ্যের আদান প্রদান এবং ইলিশের জন্য **একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা** তৈরী সহযোগিতার মূল কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে।

১৫.১১ ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরী ও জনবল অবকাঠামো জোরদার করণ

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল অপ্রতুল। উপজেলা পর্যায়ে মাত্র একজন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও একজন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সার্বিকভাবে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। ইলিশ বা মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য **মাঠ পর্যায়ে পৃথক কোন জনবল নেই**। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছ সহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে যথাক্রমে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক ও সদর দপ্তরে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/পরিচালকের (মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা) একটি করে পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাপ্ত জনবলের মধ্য হতে দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য ইতোমধ্যে ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভাগীয় প্রশিক্ষক তৈরীর কাজ চলছে।

১৫.১২ ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগত ভাবেই দরিদ্র। বানিজ্যিকভাবে ইলিশ ধরার জন্য সাধারণত: তিনটি শ্রেণী যথা- নৌকার মালিক, প্রধান মাঝি ও নাবিক জড়িত। নৌকার মালিক তার নৌকা ও জাল প্রধান মাঝিকে ভাড়া দেয়, মাঝি পরিচালনা করে এবং সাধারণ নাবিকগণ মাছ ধরে। নাবিক জেলেদের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৪,৪০০ টাকা মাত্র যা অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭ ভাগ এবং জাতীয় গড় আয়ের ২৫ ভাগ। ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ **বাংলাদেশের দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে**। যে সমস্ত জেলে প্রধান পেশা হিসাবে ইলিশ মাছ আহরণের উপর নির্ভরশীল তাদের ৬০ ভাগের চাষ যোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর, অনেক ক্ষেত্রে **নিজস্ব বাসস্থানও** নেই, ৬০ ভাগেরও বেশী লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত। বিকল্প কোন কাজ থেকে আয়-উপার্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা **জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়**। একারণে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করা অপরিহার্য।

১৫.১৩ ইলিশ মাছ পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ

ইলিশ মাছ পরিবহণ প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। সাগর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেরা সাধারণত ক্রমাগত কয়েকদিন মাছ ধরে ধৃত মাছে বরফ দিয়ে নৌকার তাপ নিরোধক ভান্ডারে মজুদ করে। অত:পর মাছ ধরা শেষে একই নৌকায় পরিবহণ করে উপকূলের পাইকারি বাজারে আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ধৃত মাছ সরাসরি বিভিন্ন পাইকারি/খুচরা বাজারে বিক্রি অথবা মহাজনের ক্যারিয়ার বোটের নিকট হস্তান্তর করে থাকে।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জেলেরা দিন-রাতের একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরার পর সরাসরি খুচরা বাজারে অথবা আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রয় করে। আড়ৎদারের নিকট হতে মাছ ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতাগণ স্থানীয় বাজারে এবং পাইকারগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে সড়ক পথ ও রেলযোগে প্রেরণ করে। সাধারণত বাঁশ অথবা হুগলা নির্মিত ঝুড়িতে মাছ রেখে মাছের উপরে এবং নিচে স্তরে স্তরে বরফ দিয়ে চট বা প্লাষ্টিকের আচ্ছাদন দিয়ে অথবা কাঠের বাক্সে একস্থান হতে অন্যস্থানে ইলিশ মাছ পরিবহণ করা হয়। বাঁশ বা হুগলার ঝুড়ি এবং চট সম্পূর্ন তাপ নিরোধক না হওয়ার ফলে পরিবহণের সময় মাছের গুণগত মান বিনষ্ঠ হয় এবং ব্যবসায়ীগণ মাছের উপযুক্ত মূল্য পায় না। মাছ ধরার পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে মাছের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং জেলেগণ উপযুক্ত বাজার মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। ফলে জেলে ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং ভোক্তাগণ পুষ্টিমান সম্পন্ন মাছ হতে বঞ্চিত হন। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ মাছ ধরার পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণসহ খুচরা বিক্রয় পর্যন্ত গুণগত মান সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছের গুণগতমান বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ ধরার পর **দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় বা সূর্য কিরণে রাখা, ধৃত মাছ নৌকা ও জলযানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা, প্রয়োজন অনুপাতে বরফ না মেশানো, বরফ প্রয়োগে বিলম্ব, তাপ অনিরোধক বাক্স, ঝুড়িতে পরিবহণ, গাদাগাদি ভাবে মাছ রাখা, রাফ হ্যান্ডলিং এবং খোলা গাড়ীতে পরিবহণ করা ইত্যাদি।** অধিকাংশ মাছের আড়ৎ এবং পাইকারি বাজার স্বাস্থ্য সম্মত নয়। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অপ্রতুল সংখ্যক বরফ কল এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য হাজার হাজার টন ইলিশ মাছ পঁচে নষ্ঠ হয়।

ইলিশ মাছের গুনগত মান সংরক্ষণের জন্য উপরোক্ত অসুবিধা সমূহের প্রতিকার করা সহ ইলিশ জেলে ও ব্যবসায়ীদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা আবশ্যক। মাছ পরিবহণের জন্য বাঁশ, হুগলার ঝুড়ি, কাঠের বাক্সের পরিবর্তে **তাপ নিরোধক প্লাস্টিকের বাক্স বা আইস বক্স, তাপ নিরোধক ভ্যান, গাড়ীর প্রচলন এবং রেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বগি সংযোজন করা যেতে পারে।** একই সাথে গুনগত মান সম্পন্ন অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উন্নতমানের বরফ উৎপাদন ও জেলে ব্যবসায়ীদেরকে, উন্নত সুযোগ সুবিধা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। মাছ ধরার পর হতে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ইলিশ মাছের গুনগত মান অক্ষুণ্ন থাকলে জেলে, ব্যবসায়ীদের আর্থিক লাভ সহ ভোক্তাগণ উপকৃত হবে এবং সার্বিকভাবে ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন হবে।

১৫.১৪ ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রডাক্ট তৈরী ও রপ্তানি

ইলিশ মাছের কৌটাজাতকরণ বা ক্যানিং এর ফলাফল অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট এর নদীকেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে উচ্চ **চাপ এবং তাপ প্রয়োগে এ মাছকে কাটামুক্ত করে সফল ভাবে কৌটাজাত করা হয়েছে।** উক্ত কৌটাজাত করণ পদ্ধতি বানিজ্যিক ভাবে

প্রচলন করা সম্ভব হলে কৌটাজাত মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি **দেশে ইলিশ মাছের লবনাক্ত ডিমের** (Brine salted roe) **ব্যাপক চাহিদা এবং উচ্চ বাজার মূল্য রয়েছে (প্রতিকেজি ৬০-৭০ আমেরিকান ডলার)**। আমাদের দেশ হতে কিছু পরিমাণ ইলিশ মাছ মালয়েশিয়াতে রপ্তানি হলেও লবনাক্ত ডিম রপ্তানি হয় না। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছের লবনাক্ত ডিম প্রস্তুত করে রপ্তানি করা হলে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ হতে প্রতিবৎসর ২,০০০-৮,০০০ মে:টন ইলিশ মাছ বরফ দিয়ে ভারতে এবং হিমায়িত মাছের (Frozen Fish) সাথে ৮০০-৯০০ মে: টন ইলিশ মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের অন্যান্য দেশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়াতে রপ্তানি করা হয়। উল্লেখিত দেশ সমূহে ইলিশ মাছের ব্যাপক চাহিদা এবং উচ্চ বাজার মূল্য আছে। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিক ভাবে সকল স্তরের জনসাধারণ ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে আরও আগ্রহী হবে।

জাটকা ধরা বন্ধ হলে - ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে